ইতিমধ্যেই বিদ্যমান রয়েছে এবং যেগুলি চা-শ্রমিকদের সত্যিই লাভবান করতে পারে সেগুলিকে টী বোর্ড পরিচালকবর্গ ও শ্রমিক সম্প্রদায় চিহ্নিত করবে সমষ্টিগতভাবে প্রচার ও কার্যে পরিণত করার জন্যে। সূচনা পর্বে, শ্রমিকদের জন্য মাইনে ছাড়াও পর্যাপ্ত আনুষঙ্গিক সুযোগ-সুবিধাগুলি প্রদানের ক্ষেত্রে নতুন করে বোঝাপড়া গড়ে তোলা এবং এই প্রসঙ্গে জনকল্যাণের ভাবনা থেকে উর্ধ্বে উঠে এটিকে জন-উন্নয়নমূলক দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করার বিষয়গুলি অবশ্যই আসা উচিৎ। আগে শুধু শ্রমিকদের পেটে-ভাতে টিকে থাকার জন্য ত্রাণ দেওয়াই ছিল উদ্দেশ্য যা আসলে মানুষের মধ্যে সেই সক্ষমতা গড়ে তোলার পরিপন্থী যা তাকে আত্ম-নির্ভরতা দিতে পারে।

কিন্তু দৃষ্টিভঙ্গি জনকল্যাণ থেকে সরিয়ে জনউন্নয়ন কেন্দ্রীক করতে হলে চা-বাগানের মানুষদের জীবনযাত্রার মান অনুযায়ী তাঁদের বঞ্চনার ইতিবৃত্তান্তকে বুঝতে হবে। এর জন্য প্রয়োজন একটি ঐতিহাসিক দৃষ্টিকোণ এবং তার সঙ্গে শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও পরিকাঠামোর মতো বিষয়গুলির উপরেও দৃষ্টি কেন্দ্রীভূত করার প্রয়োজন। দৃষ্টিভঙ্গি প্রতিস্থাপনের একটি প্রধান উদ্দেশ্য হল সরকারের শ্রেণিভিত্তিক পরিষেবাগুলির সঙ্গে চা-বাগানের জনগোষ্ঠীগুলিকে আরও ফলপ্রসূভাবে সংযুক্ত করা। এখনও অবধি সেখানে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তর পর্যন্ত শিক্ষাব্যবস্থার পরিকাঠামো থাকলেও কোন স্বাস্থ্যকেন্দ্র নেই এবং নিরাপদ পানীয় জলের মতো গুরুত্বপূর্ণ পরিষেবাগুলির দায়িত্ব চা-কোম্পানীগুলির উপরেই ন্যস্ত। কৃষিকাজের প্রশিক্ষণ ইত্যাদির মতো সরকারি কর্মসূচিগুলি চা-বাগান শ্রমিকদের কাছে পৌঁছে দেওয়া প্রয়োজন তাঁদের আয়ের উৎস বৃদ্ধিতে সাহায্যের জন্য। অনেক চা-বাগানে আজ বিদ্যুৎ পৌঁছেছে ঠিক -ই, কিন্তু তা অতি সাম্প্রতিক ঘটনা। কিন্তু এখনও এমন বহু জনসম্প্রদায় রয়েছে যাঁদের আজও সন্ধ্যাবেলা বাড়িতে কেরোসিনের বাতি জ্বালাতে হয় এবং এই অবস্থার দ্রুত সুরাহার প্রয়োজন, কারণ এই ধরনের ব্যবস্থা সংশ্লিষ্ট পরিবারগুলির স্বাস্থ্য ও তাঁদের শিশুদের শিক্ষার উন্নতির ক্ষেত্রে অন্তরায় হয়ে দাঁড়ায়।

একদিকে, চা-শ্রমিকদের জন্য জীবিকার নানাবিধ বিকল্পের সম্ভাবনাগুলিকে উন্মুক্ত করে চা কোম্পানীগুলি আসলে চা-শ্রমিকদের মধ্যে আত্মবিশ্বাস সঞ্চারিত করবে যা আদপে এই শিল্পের অস্তিত্বকে টিকিয়ে রাখার প্রশ্নে তাঁদের অংশগ্রহণকে সুনিশ্চিত করতে পারে। পরস্পরের মধ্যে একটি হার্দিক সম্পর্ক স্থাপনের ক্ষেত্রে প্রথমেই যা দরকার তা হল এমন ধরনের পরিবেশ গড়ে তোলা যা চা শিল্পকে নতুন-নতুন উচ্চতায় উৎসারিত করতে টেনে নিয়ে যাবে। উল্লিখিত অতিরিক্ত সুফলগুলির কারণে চা-শ্রমিকদের প্রকৃত আয় বৃদ্ধি পাবে এবং নিরন্তর উর্ধ্বমুখী মূল্যবৃদ্ধি সত্ত্বেও তার সঙ্গে এঁটে ওঠা যাবে। আরও গুরুত্বপূর্ণ একটি দিক হল স্বাস্থ্য, শিক্ষা এবং বিভিন্ন আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলি থেকে ঋণ পাওয়ার সুযোগ ইত্যাদি সরকারি পরিষেবাগুলি চা-বাগান সম্প্রদায়গুলির মধ্যে ফলপ্রসূভাবে পৌঁছে দিতে পারলে তা সততই আজকের মত দ্রুত পরিবর্তনশীল একটি বিশ্বে তাঁদের অংশগ্রহণের মতো পরিবেশ রচনা করতে সক্ষম হবে।

[কৃতজ্ঞতা ঃ পরিপ্রশ্ন]

# চা-বাগানে অনাহারে মৃত্যু—প্রতিকারের সন্ধানে একটি প্রাথমিক আলোচনা

অনল মুর্মু

বেশ কয়েক বছর আগেই রাষ্ট্রপুঞ্জের মানবাধিকার রিপোর্টে প্রকাশ করা হয়েছে যে সাহারা নিম্নবর্তী বিশ্বের সবচাইতে দরিদ্রতম ১৬টি দেশের চাইতেও বেশী দরিদ্র মানুষ বাস করেন ভারতের পশ্চিমবঙ্গ, ওড়িশা, ঝাড়খণ্ড, বিহার, ছত্তিশগড় ও মধ্যপ্রদেশ রাজ্যে। এর মধ্যে শিল্পের ধারাবাহিক রুগ্নতা; কৃষিতে উপর্যুপরি সঙ্কট; '৪৭-র দেশভাগ থেকে '৭১-র যুদ্ধ ; সাম্প্রদায়িকতা, দাঙ্গা, রাজনৈতিক অস্থিরতা ও অর্থনীতির কারণে পূর্ব পাকিস্থান, বাংলাদেশ ও নেপাল থেকে ব্যাপক অভিবাসন; কর্মসংস্থান ও সামাজিক নিরাপত্তার কারণে অসম , বিহার, ঝাড়খণ্ড ও ওড়িশা থেকে ব্যাপক অভিবাসন; সামগ্রিক জমির চাইতে লোকসংখ্যা বৃদ্ধি; রাজনৈতিক হানাহানি ও হিংসা প্রভৃতির জন্য পশ্চিমবঙ্গের অবস্থা খুবই করুণ। এর সাথে ভৌগলিক অবস্থান, প্রাকৃতিক দুর্যোগ, পশ্চাদপরতা, অনুন্নয়ন, দুর্বল প্রশাসন,দুর্নীতি, আমলাতন্ত্র, নোংরা রাজনীতি মিলিয়ে আয়লা বিধ্বস্ত সুন্দরবন, আদিবাসী অধ্যুষিত পশ্চিমাঞ্চলের জঙ্গলমহল, নদীভাঙ্গন পূর্ণ মালদা ও মুর্শিদাবাদের চর অঞ্চল, বর্দ্ধমান-বীরভূমের খাদান, সুবিস্তৃত ছিটমহল, দার্জিলিং পাহাড় ও জলপাইগুড়ির প্রত্যন্ত জনপদ ও বনবস্তী এবং তরাই-ডুয়ার্সের চা-বাগানের দুরবস্থা আরও প্রকট। উক্ত অঞ্চলের আমলাশোল, ওদালচুহা, ঢেকলাপাড়া, মুজনাই, গুমলা প্রভৃতি এলাকা তেকে উঠে আসছে অনাহারে মৃত্যুর একের পর এক মর্মন্তদ কাহিনী। ঢেকলাপাড়ায় যে পর পর অনাহারে মৃত্যুর খবর এসেছে তাকে জরুরী ভিত্তিতে মোকাবিলা করার প্রয়োজন। চা বাগান কর্তৃপক্ষ এবং স্থানীয় পঞ্চায়েত ও জন প্রতিনিধিদের সঙ্গে নিয়ে প্রশাসনকে দ্রুত পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। সমাজ কল্যাণ দপ্তর ও খাদ্য নিয়ামকের সহায়তায় অবিলম্বে বিভিন্ন পশ্চাদপর ও দারিদ্র্য মোচন কর্মসূচীর অধীনে বিনামূল্যে খাদ্যশস্য, নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্য, শুকনো ও তৈরী খাদ্য, অর্থ নিয়মিতভাবে আগামী বেশ কিছুদিন সরবরাহ করতে হবে এবং সেখানে যাতে কোন বৈষম্য, দুর্নীতি, ফাটকা ইত্যাদি না হয় তা কঠোরভাবে নজর রাখতে হবে। তাদের বস্ত্র ও শীতের বস্ত্র দিতে হবে। বাসস্থানগুলি বাস করার

মত সারাই করে দিতে হবে। নতুবা বন্ধ কারখানার কোন বড় হল ঘর মেরামতী করে ডরমিটারী তৈরী করে বাসস্থানের ব্যবস্থা করা যেতে পারে। বাথরুম-পায়খানাগুলিকে ব্যবহারের উপযোগী করে তুলতে হবে। প্রয়োজনে যৌথ রান্নাঘর বানিয়ে অথবা স্বয়ম্ভর গোষ্ঠীর মাধ্যমে রান্না করা পুষ্টিকর খাদ্যসরবরাহ করতে হবে। বিভিন্ন স্বেচ্ছাসেবী ও সেবামূলক সংস্থার সাহায্য গ্রহণ করা যেতে পারে। স্বাস্থ্য দপ্তরের সাহায্যে রোগীদের সঠিকভাবে চিকিৎসা করতে হবে এবং ম্যালেরিয়া, যক্ষ্মা, কালাজ্বর, কুষ্ঠ প্রভৃতি প্রাদুর্ভাবপূর্ণ রোগগুলিকে পূর্ণাঙ্গ 'ডটস্' চিকিৎসার মাধ্যমে নিরাময় করতে হবে। প্রতিটি পরিবারকে কীটনাশক লাগানো মশারি দিতে হবে এবং নবজাতক, শিশু, প্রসূতি ও বৃদ্ধ-বৃদ্ধাদের স্বাস্থ্যের প্রতি বিশেষ যত্ন নিতে হবে।

কিন্তু কেবলমাত্র হৈ-চৈ করে অথবা ডোল দিয়ে কিংবা ঘটনাগুলিকে বাড়িয়ে-কমিয়ে দেখে, অবজ্ঞা করে, এর কোন স্থায়ী সমাধান হবে না। এরজন্য চাই রাজনৈতিক সদিচ্ছা, বিচক্ষণতা ও দুরদৃষ্টি; বিজ্ঞানসম্মত, পরিবেশ বান্ধব ও অর্থনৈতিক ভাবে কার্যকরি সঠিক পরিকল্পনা; স্থানীয় জনসমাজ, জন প্রতিনিধি, পঞ্চায়েত ও চা-বাগান কর্তৃপক্ষ ও কর্মীদের আন্তরিক যোগদান এবং প্রশাসনেরদক্ষতা, তৎপরতা ও পরিচালনা। বেশ কিছু মধ্যবর্তী ও দীর্ঘস্থায়ী পদক্ষেপ নিতে হবে।

মধ্যবর্তী পদক্ষেপের অঙ্গ হিসাবে প্রথমেই বাগানগুলি সহ আদিবাসী ও উপজাতি অধ্যুষিত তরাই-ডুয়ার্স-পাহাড়ে গণবন্টন ব্যবস্থাকে শক্তিশালী ও কার্যকরী করেতুলতে হবে। সেখানে থেকে নিয়মিত অতিস্বল্পমূল্যে খাদ্যশস্য, নুন, চিনি, ভোজ্য তেল, ডাল, আলু, পিঁয়াজ, কেরোসিন, শাড়ি, ধুতি, গামছা, মশারি, ব্যাটারি প্রভৃতি নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্য সরবরাহ করতে হবে। দ্রব্যের গুণমান, সরবরাহ এবং বন্টনে স্বচ্ছতার উপর নজর রাখতে হবে। উপস্বাস্থ্য কেন্দ্র, প্রাথমিক স্বাস্থ্য ও ব্লকস্বাস্থ্য কেন্দ্র এবং মহকুমা ও জেলা হাসপাতাল গুলিকে কার্যকরী করে তুলে প্রয়োজনীয় স্বাস্থ্য পরিষেবার ব্যবস্থা করতে হবে। জননী ও নবজাতক সুরক্ষা, যক্ষ্মা নিয়ন্ত্রণ, ম্যালেরিয়া, কালাজ্বর ও কুষ্ঠ নিয়ন্ত্রণ জাতীয় কর্মসূচীগুলির উপর জোর দিতে হবে। স্থানীয় মহিলাদের থেকে ASHA, AWW প্রভৃতি নিয়োগ করতে হবে। পি.এইচ.ই দপ্তরকে নদীর বা / গভীর নলকূপের জল পরিশ্রুত করে নলবাহিত নিরাপদ পানীয়জল সরবরাহ করতে হবে। আলাপ আলোচনার মাধ্যমে দ্রুত বেশী সংখ্যক চা-বাগান খুলতে ও উৎপাদন শুরু করতে হবে। রুগ্ন ও পরিত্যক্ত বাগানগুলিতে সরকারি সহায়তায় শ্রমিক সমবায় শুরু করা যেতে পারে। এর বাইরে যারা থাকবেন তাদের একশ দিনের কাজ, বিভিন্ন কেন্দ্রীয় প্রকল্প সহ নির্মাণ শিল্প, সড়ক নির্মাণ ও সরাই প্রভৃতি কাজে নিয়োগ করতে হবে। 'স্বয়ম্ভর গোষ্ঠী' তৈরী করে স্বল্প ঋণ ও প্রযুক্তির সাহায্যে কৃষি, মৎস্যচাষ, বনসৃজন, পরিবহন ও পর্যটনের মত বিষয়ে কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করতে হবে। মহিলাদের স্বয়ম্ভর গোষ্ঠী করে হস্তশিল্প, মিড-ডে মিল, হাসপাতাল, সরকারী দপ্তরের ক্যান্টিনে রান্না প্রভৃতি কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করতে হবে। নির্দিষ্ট ক্ষেত্রে ঠিকমতো বার্ধক্য ও বিধবা ভাতা, প্রতিবন্ধী ও জাতিগত শংসাপত্রের ব্যবস্থা করতে হবে। সমগ্র অঞ্চলের স্কুল ও কলেজগুলি সচল করে তুলতে হবে।গরীবদের ভূমির পাট্টাদান এবং নিজভূমে নিজগৃহ প্রকল্পে ঋণ ও কারীগরী সাহায্য দিতে হবে।

চা হচ্ছে এই অঞ্চলের প্রাণ ভোমরা। প্রথমে সামশিং বা চালশা বা হাসিমারায় বা অন্যত্র উপযুক্ত স্থান নির্বাচন করে অসমের যোরহাটের টোকলাইয়ের মত একটি আধুনিক চা গবেষণাগার গড়ে তুলতে হবে। তার তত্ত্বাবধানে শতাব্দী প্রাচীন চা বাগানগুলিকে উপযুক্ত পরিচর্যার মাধ্যমে পুনরায় বিশ্বমানের গড়ে তুলতে হবে। আর্ন্তজাতিক বাজারে চীন ও শ্রীলঙ্কার চা এবং ভারতীয় বাজারে অসম, সিকিম ও মুন্নারের চাকে মোকাবিলা করতে হলে আমাদের উন্নত প্রযুক্তি, জৈব সার ব্যবহার, কম খরচে বেশী উৎপাদন, সবুজ ও সুগন্ধী চা সহ বিভিন্ন চাহিদার চা তৈরী, উপযুক্ত সংরক্ষণ, প্যাকেজিং, বিজ্ঞাপন, বাজার ও রপ্তানীর ব্যবস্থা করতে হবে এবং জয় করতে হবে শ্রমিক অসন্তোষ ও রাজনৈতিক অস্থিরতাকে। শিলিগুড়িতে আর্ন্তজাতিক চা-বাজার ও নিলাম এবং শিলিগুড়িকে কেন্দ্র করে বিমান, রেল ও সড়ক পথে দেশ ও বিদেশে চা রপ্তানীর উপযুক্ত পরিকাঠামো গড়ে তুলতে হবে। সরকার এবং ব্যক্তি মালিকানার উৎপাদকরা যেমন রাজস্ব ও মুনাফা বৃদ্ধির কথা ভাববেন সে রকম রাজস্ব ও মুনাফার একটি ভাল অংশ ব্যয়

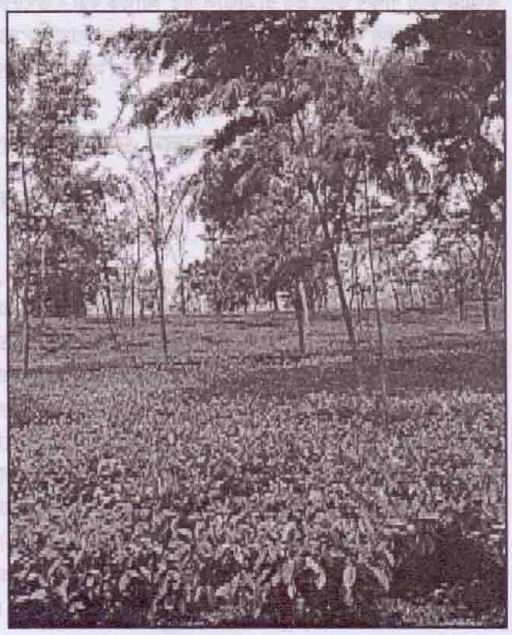

করবেন পরিকাঠামো উন্নয়ন ও শ্রমিক কল্যাণে। রাজ্যের শিল্পমন্ত্রকের অধীনে অথবা পৃথক চা-মন্ত্রক খুলতে হবে এবং উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ে টি-টেকনোলোজিতে ডিপ্লোমা শুরু করতে হবে।

এবার অপার্থিব নিসর্গ সৌন্দর্য, মনোরম আবহাওয়া এবং চমৎকার সব পাহাড় অরণ্য ও নদীতে ভরা এই অঞ্চলে সামগ্রিক পর্যটন শিল্পে জোর দেওয়ার পাশাপাশি পরিবেশ বান্ধব চা- পর্যটন শিল্পের উপর জোর দিতে হবে। এক্ষেত্রে নীলগিরির ডোডাবেতার মত টি-মিউজিয়াম স্থাপন, টি-ট্যুর প্যাকেজিং, কুন্নুরের মত আকর্ষণীয় টি-বাংলো নির্মাণ বা বাগানের পুরনো সাহেবী বাংলাগুলির পুনর্নির্মাণ করে পর্যটন দপ্তর ও প্রাইভেট ট্যুর অপারেটরদের সিন্ডিকেটের সহায়তায় চা-পর্যটনকে জনপ্রিয় করা যাবে। বাগান ও এলাকার ভাল আয় হবে, প্রচুর বিদেশী মুদ্রা আসবে, এখানকার চাকে বিভিন্ন আকর্ষণীয় ব্র্যান্ডের মোড়কে ও স্বাদে বিভিন্ন আউটলেটের মাধ্যমে জনপ্রিয় করা যাবে এবং চা- রপ্তানী বাড়বে। প্রতি হেক্টর চা-বাগিচা বাতাস থেকে প্রায় ৩০ টন কার্বন ডাই অক্সাইড গ্রহণ করে ও অক্সিজেন ছড়ায় এই সমস্ত ইতিবাচক তথ্য তুলে ধরে, নানারকম জঙ্গল সাফারি, অ্যাডভেঞ্চার ট্যুরের মাধ্যমে পর্যটকদের আকর্ষণ করতে হবে।

এরপর বেকার যুবক-যুবতীদের প্রশিক্ষণ, ঋণ ও কারিগরি সহায়তা দিয়ে সমতলে ক্ষুদ্র চা বাগিচা বিস্তারের পদক্ষেপ নিতে হবে কারণ এর যথেষ্ট সম্ভাবনা আছে। তারপর জোর দিতে হবে মশলা চাষে। ছোট ও বড় এলাচ, কালো ও গোল মরিচ, ভ্যানিলা, দারচিনি, লবঙ্গ ইত্যাদি রপ্তানি করে দক্ষিণ ভারতের রাজ্যগুলি গত আর্থিক বছরে ৯৭৮৪ কোটি টাকা আয় করেছে। মার্কো পোলো, ভাস্কো দা গামার সময় থেকে আজ অবধি বিদেশে ইন্দোনেশিয়া ও ভারতের মশলার চাহিদা ও বাজার অটুট রয়েছে। মশলার পাশাপাশি পাহাড়, ডুয়ার্স এবং সংলগ্ন এলাকায় অর্থকরী ফুল ও ভেষজ উদ্ভিদ চাষ ও বাজারজাতকরনের উপর জোর দিতে হবে। এছাড়াও সম্ভাবনা আছে আনারস, কমলা, নাশপাতি প্রভৃতি অর্থকরী ফল চাষের। জোর দিতে হবে ডেয়ারি ও পোল্টিশিল্পে। গৃহপালিত গোরুর মল-মূত্রও চা-বাগান ও বাগিচা চাষে জৈব সার এবং গোবর গ্যাস-প্ল্যান্টের মাধ্যমে বিদ্যুৎ উৎপাদনের কাজে লাগবে। বিদ্যুৎ সঙ্কটের যুগে সৌর বিদ্যুৎ এবং ব্যাপক বর্ষার জল সংরক্ষণ করে সারা বছর কৃষি, গৃহস্থলি ও অন্য কাজে লাগানোর ব্যবস্থা করতে হবে।

স্কুল-কলেজ, পলিটেকনিক খুলে শিক্ষার মান এবং আধুনিক বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিগত জ্ঞান বাড়িয়ে তুলতে হবে। বাংলা, হিন্দি,সাদরি, নেপালী, সব কটা ভাষাতেই শিক্ষার সুযোগ রাখতে হবে! ওঁরাও, মুন্ডা, সাঁওতাল, মাহালী, লিম্বু, রাই, শেরপা, তামাং, মাহাতো প্রভৃতি চা- জনজাতি গুলির সংস্কৃতিকে রক্ষা করার বিষয়ে যত্নশীল হতে হবে। ধূমপান, ড্রাগ ও মদ্যপান বিরোধী প্রচারকে শক্তিশালী করতে হবে এবং সামাজিক-প্রশাসনিক-পুলিশী-আইনী সমন্বয়ে নারী পাচার রোধ করতে হবে। মোট কথা নেতিবাচক মনোভাব সরিয়ে রেখে পশ্চাদপর অবহেলিত অথচ অফুরন্ত সম্পদে ভরপুর উত্তরবঙ্গের উন্নতির সামগ্রিক ফ্রেমে চা-বাগান গুলির ও চা-শিল্পের উন্নতি করতে হবে দীর্ঘমেয়াদী সুষ্ঠ পরিকল্পনায়। আর এই মুহূর্তে সরকার থেকে নাগরিক, স্বেচ্ছাসেবী, সেবামূলক সংগঠন সকলকে ঝাঁপিয়ে পড়তে হবে যাতে আর কোন অনাহারে মৃত্যু না ঘটে, অপুষ্ট ও রুগ্ন ব্যক্তিদের চিকিৎসায়, গৃহহীনদের বাসস্থান জোগানোর এবং ধ্বস ও বন্যায় নিরাপদ আশ্রয়ে স্থানান্তর ও প্রবল শীতে উপযুক্ত বস্ত্র সরবরাহের কাজে।

## গোর্খাল্যান্ড আন্দোলন এবং দার্জিলিং পাহাড়ের লেপচাদের পরিচিতির লড়াই

**প্রদীপন গাঙ্গুলী**

দার্জিলিং পাহাড়ের আদিমতম বাসিন্দা হল লেপচা সম্প্রদায়। দার্জিলিং, কালিম্পং প্রভৃতি শহরের নামগুলি লেপচা শব্দ এবং দার্জিলিং পাহাড়ের প্রতেকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের সাথে লেপচা ঐতিহ্য যুক্ত। গোর্খাল্যান্ড আন্দোলনের উত্থানের সাথে সাথে লেপচাদের পরিচিতির বিষয়টি প্রশ্ন চিহ্নের মুখে পড়ে যায়। গোর্খা শব্দটির মাধ্যমে সমস্ত নেপালী ভাষার মানুষকে এক সাথে করে দেখাবার চেষ্টা করা হলেও লেপচারা নিজেদেরকে বরাবর এর থেকে পৃথক রেখেছে। তারা নিজেদের আলাদা অস্তিত্ব বজায় রাখতে সচেষ্ট ছিল। তাদের নিজেদের আলাদা ভাষা রয়েছে যা অন্যান্য জনজাতির ভাষা থেকে অনেক সমৃদ্ধ। লেপচা ভাষায় অনেক সাহিত্য রচিত হয়েছে। লেপচাদের নিজস্ব লিপি রয়েছে এবং সিকিম রাজ্যে লেপচা ভাষাতে স্কুল স্তরে পড়ানো হয়। A.R.Fonning এর মত শিক্ষিত লেপচা সম্প্রদায়ের মানুষ লেপচা ভাষাতেই সাহিত্য রচনা করতেন। A.R.Fonning কালিম্পং এ বসবাস করেন। দার্জিলিং এ লেপচা ভাষাতে অনেক উল্লেখযোগ্য কাজ করেছেন। লেপচা সম্প্রদায়ের মানুষ A.R.Fonning, NT Lepcha প্রমুখের নেতৃত্বে আন্দোলন গড়ে তোলে। আন্দোলনের মূল বিষয়বস্তু ছিল গোর্খাল্যান্ড আন্দোলন থেকে নিজেদের পৃথক করে দেখানো অর্থাৎ নিজেদের পরিচিতির লড়াইকে সামনে আনা। শিলিগুড়ি শহরে লেপচা সম্প্রদায়ের মানুষেরা বিভিন্ন সময়ে তাদের সংস্কৃতি নিয়ে হাজির হয়েছে। তারা প্রকাশ্যে বলেছে তথাকথিত গোর্খা সংস্কৃতির সাথে তাদের সংস্কৃতির যথেষ্ট ফারাক রয়েছে। তাদের ভাষা অনেক সমৃদ্ধ এবং স্কুলস্তরে যেন লেপচা ভাষাতে পাঠদান করা হয়। মেট্রো চ্যানেল, কলেজ স্কোয়ার